আমি কান পেতে রই
তসলিমা নাসরিন

কলকাতায় অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা আমার হচ্ছে। এখানকার ইস্কুল কলেজ পাশ করা বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনো মেয়েরা, স্বনির্ভর কী স্বনির্ভর নয়, বলে বেড়ায় যে নারীরা সমানাধিকার পেয়ে গেছে। আপত্তি জানালে শ্লেষ ফুটে ওঠে ঠোঁটের কিনারে, শ্লেষের অনুবাদ করে নিই নিজ দায়িত্বে। আমি এদেশি নই বলে এ বিষয়ে আমি জানি না। নারী নির্যাতন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনেকে আকাশ থেকে পড়ে, নির্যাতনের কথা শুনেছে তারা কিছু, তবে, ঠিক কোথায়, কীভাবে, জানেনা। সেঁটে থাকলে বিস্তর ভেবে নাক ঠোঁট কুচকে বলে দেয়, হাঁ হলে গ্রামে হয় ওসব। শহরে নয়।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। আমাকে খুব বোকা দেখতে লাগে।
খুব অস্ফুট স্বরে হয়তো জিজ্ঞেস করি, শহরে কোনও নির্যাতন নেই?
মাথা নাড়া উত্তর। না।
কোনও বৈষম্য?
না। না। এখানে মেয়েরা খুবই স্বাধীন।
তা বটে। স্বাধীন। স্বাধীনতার মানে কাকে বলে, এই মেয়েরা কি জানে? আমি নিশ্চিত, জানে না। এই যে স্বাধীন বলে নিজেদের তারা মনে করছে, মন তাদের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না বলেই বলছে যে তারা স্বাধীন।
অধিকার কি সব পাওয়া হয়েছে?
হ্যাঁ সবটাই।
সত্যিই কি?
উমমম খুব ইনটিরিয়রে, মানে একেবারে গ্রামে অবশ্য মেয়েদের অধিকার পাওয়া হয়নি ততটা। বেচারা, ওদের জন্য সত্যিই মায়া হয়।

শুনে, গ্রামের মেয়ের চেয়েও শহুরে মেয়ের জন্য বেশি মায়া হতে থাকে আমার। লেখাপড়া জানা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া দুচারটে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মেশা মেয়ে স্বাধীনতার শীর্ষে উঠে গেছে বলে বিশ্বাস করছে। সে দেখেনা তার হাত পায়ে যে শিকল পরানো। সে বোঝে না যে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার পূর্ব নারীরা যেমন যৌনসামগ্রী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছিল, তেমন সেও। আধুনিকতার হাওয়া লাগা মেয়েরা পুরুষের ভোগের ক্ষিধে বরং তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই শহুরে স্বাধীন নারী শাখা সিঁদুর পরে এবং স্বামীর পদবী ধারণ করে নিজেই জানান দিচ্ছে যে সে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বামী নামক যে

পদার্থটি তার আছে, সেটি তার নিরাপত্তা, যে নিরাপত্তাটি বিগড়ে গেলে তার সমূহ বিপদ, যে নিরাপত্তাটি খসে গেলে সেও খসে পড়বে।

অর্থ উপার্জনে কী লাভ, যদি একা দাঁড়াবার মতো মনের শক্তি এবং সাহস না থাকে! আমি অনেক স্বনির্ভর মেয়েকে দেখেছি সমাজের নারীবিরোধী নষ্টপচা নিয়মের সামনে নির্বিকার মাথা নোয়াতে। নিজের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা এবং তা অর্জনের জন্য সব রকম ঝুঁকি নেওয়া সব শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর মেয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।

গ্রামের অনেক নিরক্ষর মেয়েকেই আমি দেখেছি উচ্চশিক্ষিত শহুরে দাসী বাঁদীদের চেয়েও বেশি অধিকারবোধ নিয়ে বাঁচে। একটু এদিক ওদিক কেউ করলো তো কোমরে আঁচল বেঁধে গুষ্ঠি তুলে গালাগাল করে তবে ছাড়লো। গায়ে আঁচড় লাগলো, লেঠেল নামিয়ে দিল। নিজের হক আদায় করতে ওস্তাদ তারা। রীতিমত যুক্তি দিয়ে তর্ক করে। শহরের মসজিদে কোনও মেয়ের গিয়ে সাহস নেই নামাজ পড়ে আসে। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে গিয়ে বিষম বিপ্লব করে নামাজ পড়ে এল পশ্চিমবঙ্গেরই এক গ্রামে, এই সেদিন। ধর্মচারণ করে যে মেয়েদের সত্যিকার কোনও লাভ হয় না, তা না জেনেও কিছু একটা তো করে ফেলল, যে কিছুটা ওই সমাজে নিষিদ্ধ ছিল! মেয়েদের পথগুলো শত সহস্র নিষেধের আবর্জনায় ভরা , পথ চলতে গেলে তাদের প্রধান দায়িত্ব যাবতীয় নিষেধগুলো আগে আস্তাকুঁড়ে ফেলা।

গ্রামের মেয়েরা সময় সময় রুখে ওঠে, বুঝে না বুঝে বিপ্লব বাধিয়ে ফেলে ঠিক, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, গ্রামে যে অশিক্ষা কুশিক্ষা ছিল, তা নেই। নারীনির্যাতন নেই। এখনও সেসবের সবই আছে। বাল্যবিবাহ, পণপ্রধা, স্ত্রীহত্যা, ধর্ষণ, খুন বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। তবে তলে তলে বেশ ক বছরে বেশ বদলেও গেছে কিন্তু গ্রামের কিছু চিত্র। মেয়েরা ইস্কুলে আগের চেয়ে বেশি যাচ্ছে। ইস্কুল হয়তো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে একটা সময়ে, কিন্তু যাওয়ার ঢেউটা নতুন। দারিদ্র যে একটি বড় কারণ ইস্কুলে না যাওয়ার, তা ইস্কুলের মিডডেমিলই প্রমাণ করে। ভাত পাবে বলে ইস্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে যায়। ভাত না পেলে ভাত অন্য কোথাও থেকে যোগাড়ে লেগে যায়। অ আ ক খ দিয়ে কারুর তো ক্ষিধে দূর হয় না। মেয়েদের জন্য ঘর সংসারের কাজ করা, বিয়ে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণ ইস্কুল ছাড়ার। এই ঝামেলা যাদের নেই, তারা দেখা যায়, দিব্যি ইস্কুল শেষ করে কলেজ অবদি পড়তে যাচ্ছে। সাইকেল চালিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, গ্রামের রাস্তাকে আলোকিত করতে করতে যাচ্ছে। শহুরে কজন মেয়ে সাইকেল চালায়? কলকাতায় আমি একটি মেয়েকেও এ পর্যন্ত দেখিনি।

শহরের চেয়ে গ্রামের সংখ্যাই যেহেতু বেশি, শহুরে মেয়ের তুলনায় গ্রামের মেয়েই যেহেতু অধিক, গ্রামেই তরতর করে বাড়াতে হবে নারীশিক্ষা। সই করতে পারলেই শিক্ষিত নাম দিয়ে ঢপ মেরে আসা হয়েছে বহুকাল। এবার এসব বন্ধ হোক। শিক্ষিত মানে সই করতে পারা তো নয়ই, ইতিহাস ভুগোল বিজ্ঞান পড়ে ডিগ্রি অর্জন করাও নয়, শিক্ষিত মানে নিজের অধিকার বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া। নারী যে কারও খেলনা নয়, পুতুল নয়, দাসি নয়, বস্তু নয়, যন্ত্র নয় ----- সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়াই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

একটি সমাজ কতটুকু উন্নত, তা ওই সমাজে নারীর উন্নতি কেমন তার ওপর নির্ভর করে। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। গোটা জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। এই অর্ধেক সংখ্যক মানুষ যদি অশিক্ষিত এবং পরনির্ভর থেকে যায়, যদি নির্যাতিত এবং অত্যাচারিত থেকে যায়, সমাজের জন্য যদি এই বিপুল সংখ্যার মেধা, বুদ্ধি , শক্তি, ক্ষমতা কিছু কাজে না লাগে তবে সেই সমাজ তো পিছিয়েই থাকবে। নারী পিছিয়ে থাকলে প্রগতি পিছিয়ে থাকে। নারী পিছিয়ে থাকলে সভ্যতা পিছিয়ে থাকে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিঃসন্দেহে আকাশ ছুঁচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় নারীর সার্বিক উন্নয়ন কিন্তু প্রায় পাতাল স্পর্শ করেই আছে। নারীর অধিকার, মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধির ব্যবস্থা, ধর্মমুক্ত, সংস্কারমুক্ত সুস্থ জীবনের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করার জন্য শক্তিশালি কোনও নারী আন্দোলন নেই এ দেশে। কী রকম হবে তবে সেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যদি অর্ধেক জনসংখ্যাই বঞ্চিত থাকে নিজেদের অধিকার থেকে! সেই উন্নয়ন সত্যিকার উন্নয়ন নয়, যে উন্নয়ন নিয়ে গৌরব করা যায়। সৌদি আরব এবং সুইডেন, দুটো দেশই ধনী দেশ। তফাত কিন্তু ভয়াবহ। গণতন্ত্রে, বাক স্বাধীনতায়, মানবাধিকারে সুইডেন ১০০ পেলে, সৌদি আরব পাবে ০। একটি সভ্য, অন্যটি নিশ্চিতই অসভ্য।

নারীকে কেউ স্বাধীনতা হাতে দিয়ে বলবে না নাও। নারীকে লড়াই করে নিজের স্বাধীনতা নিজেকে নিতে হবে। নারী নিজেই জানে না কী থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। শতাব্দির পর শতাব্দি তো নারীর মস্তিস্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা দাসির জাত। কী করে মুক্তি পাবে নারী! তবু আমি কান পেতে রই। কান পেতে রই দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা নারীর জেগে ওঠার শব্দ শুনবো বলে।